গ্লোবাল ট্রাজেডি: মানব পাচার

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

মানব পাচার আজ বিশ্বের সর্বাধিক বিস্তৃত মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলোর একটি, যা মানবতাকে বাণিজ্যের বস্তুতে পরিণত করেছে। এটি শুধুমাত্র অপরাধ নয়, এটি একটি গ্লোবাল ট্রাজেডি যা কোটি কোটি মানুষের জীবন বিনষ্ট, উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরো জোরদার করে। মানব পাচার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, শ্রমের অনৈতিক ব্যবহার, যৌন নিপীড়ন এবং আধুনিক দাসত্বের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও মর্যাদা চিরতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আধুনিক বিশ্বের এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা মানবতাবিরোধী এ মানব পাচার । প্রযুক্তি, সভ্যতা ও মানবাধিকারের বুলি যতই উচ্চারিত হোক না কেন, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই আজও মানুষ মানুষকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করছে। জাতিসংঘের ভাষায়; মানব পাচার হলো দাসত্বের আধুনিক রূপ যেখানে প্রতারণা, বলপ্রয়োগ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে শোষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। যৌন শোষণ, জোরপূর্বক শ্রম, গৃহকর্মে নির্যাতন, অঙ্গ পাচার সবই মানব পাচারের একেকটি ভয়াবহ রূপ।

মানব পাচার হলো এমন একটি অপরাধ যা নারকীয় প্রতারণা, জোরজবরদস্তি বা অসৎ প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, আশ্রয়দান বা গ্রহণ করা হয়, যাতে তাকে শ্রম, যৌন কাজে বাধ্য করা বা অন্য কোনো ধরনের মানব শোষণে লাগানো হয়। মানব পাচারের ইতিহাস সরাসরি দাসপ্রথা ও বন্দিত্বের চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। আধুনিক মানব পাচারকে প্রায়ই আধুনিক দাসত্ব বলা হয়, কারণ এটি পুরোনো দাসপ্রথার মতোই মানুষের স্বাধীনতা ও ইচ্ছার বিপরীতে তাদের শোষণ করে। যদিও দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু টেকসই বৈশ্বিক উন্নয়ন, গ্লোবালাইজেশন, অনিয়মিত অভিবাসন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলো আধুনিক মানব পাচারকে আরও জটিল এবং বিস্তৃত করেছে। বিশ্বায়নের ফলে যোগাযোগ ও যাতায়াত সহজ হওয়ায় পাচারকারীরা নতুন নতুন কৌশল নিচ্ছে। ভুয়া চাকরির প্রলোভন, বিদেশে ভালো জীবনের স্বপ্ন, প্রেম বা বিয়ের ফাঁদ সবই ব্যবহৃত হচ্ছে মানব পাচারের হাতিয়ার হিসেবে। এ অপরাধটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত ছাড়াও দেশান্তরী হিসেবে ঘটে এবং কখনও কখনও স্বদেশে অবৈধভাবে আন্ধকারেও সংঘটিত হয়।

‘ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম (UNODC)’ এর ২০২৪ সালের ‘গ্লোবাল রিপোর্ট অন ট্রাফিকিং ইন পারসনস’ অনুযায়ী ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে মানব পাচারের শনাক্তকৃত ঘটনা প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলা ও মেয়েরা মোট শনাক্তকৃত শিকারদের ৬১ শতাংশ, যার মধ্যে বেশিরভাগই যৌন exploitation এর জন্য এবং পুরুষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ শ্রম বা বাধ্যতামূলক কাজের জন্য পাচার হয়। মোট শনাক্ত ভিকটিমদের ৩৮শতাংশ শিশু, যেখানে মেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

মানব পাচারের প্রধান তিনটি ধরনের মধ্যে প্রথমত হলো যৌন শোষণ। মহিলা ও মেয়েদের সবচেয়ে বেশি এই শোষণের লক্ষ্য করা হয়। মানব পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো প্রমাণ করে, যৌন কাজে বাধ্য করা মানব পাচারের অন্যতম প্রধান রূপ। দ্বিতীয়ত শ্রম শোষণ। ঋণ ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা। মাছ ধরা, নির্মাণ, কারখানা ব্রেইডিং, হোম সার্ভিস সব ক্ষেত্রেই শ্রম শোষণ ঘটে। সর্বশেষ অন্যান্য শোষণ অর্থাৎ জোরপূর্বক চোরাচালান, জঙ্গি শোষণ, বাচ্চাদের জোর করে বিভিন্ন কাজে বাধ্য করা বা অবৈধ যে কোনো কাজের নিমিত্তে বাধ্য করা।

মানব পাচারের কারণগুলো জটিল ও বহুমুখী । সমাজ, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি সবই এতে ভূমিকা রাখে। এগুলোর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো; দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে কিছু মানুষকে সুযোগ সন্ধানী মনোভাবাপন্ন পাচারকারীরা ফাঁদে ফেলে থাকে। গ্লোবালাইজেশনের ফলেও মানব পাচার হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রনহীন সীমান্ত ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ পাচারকারীদের জন্য এ সুযোগ তৈরি করে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি; যেমন যুদ্ধ, উদ্বাস্তু অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মানুষের দুর্বল অবস্থাকে বাড়িয়ে তোলে। ফলে সেসব এলাকার মানুষ পাচারের শিকার হয়। কিছু সংস্কৃতিতে নারী ও শিশুর মর্যাদা কম। এমন সামাজিক ও নৈতিক উপেক্ষা বা সামাজিক মানসিকতা পাচারকারীদের কাজে উৎসাহ দেয়ায় পাচারের ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশ মানব পাচারের একটি ট্রানজিট ও উৎস দেশ হিসেবে পরিচিত, যেখানে বহু মানুষ পাচারের শিকার হয়। এর প্রধানতম কারণগুলো হলো; দরিদ্রতা ও কর্মসংস্থানের অভাব, সীমান্তের কম নিরাপত্তা, প্রচার প্রচারণার অভাব ও জনগণের অজ্ঞতা। মানব পাচারের ভুক্তভোগীরা শুধু শোষণের শিকার নয় বরং তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনও পরিবর্তিত হয়ে যায়। শারীরিক নির্যাতন ও স্বাস্থ্য সমস্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘমেয়াদী মানসিক ট্রমা ও ‘পোস্ট ট্রমাটিক স্টেজ ডিসঅর্ডার (PTSD)’ দেখা যায়। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সম্প্রদায়ের অবমূল্যায়ন ভিকটিমদের পুনর্বাসনকে কঠিন করে তোলে।

মানব পাচার রোধে বৈশ্বিক উদ্যোগের মধ্যে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো পালের্মো প্রটোকল - ২০০০। এটি মানব পাচারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আইন প্রণয়ন, অপরাধীদের শাস্তি ও ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার নির্দেশনা দেয়। বিশ্বব্যাপী মানব পাচার বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈধ কাঠামো হলো 'ইউনাইটেড নেশনস ট্রাফিকিং প্রটোকল' যা 'ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইনেস্ট ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম' এর উপ প্রটোকল হিসেবে ২০০০ সালে গৃহীত হয়। এই প্রটোকলটি মানব পাচারের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নির্ধারণ, অপরাধকে আইন ভঙ্গ করে গণ্য করা, এবং শিকারদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দেয়। এই প্রটোকল অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ আইনে মানব পাচার অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি শিকারদের জীবিকায় সহায়তা, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এছাড়া, 'ইউনাইটেড নেশনস ভলেন্টারি ট্রাস্ট ফান্ড ফর ভিক্টিমস অফট্রাফিকিং ইন পারসনস' মানব পাচারের শিকারদের পুনর্বাসন, আইনি সহায়তা ও নিরাপদ পুনর্বাসনে অর্থায়ন দেয়। 'প্রমোটিং একশন এন্ড কোঅপারেশন আগিনেস্ট ট্রাফিকিং ইন হিউম্যান বিংস এন্ড দা স্মাগলিং অফ মাইগ্রেন্টস' (PACTS) প্রকল্প, যা বিভিন্ন দেশের পুলিশ, বিচার বিভাগ ও সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে মানব পাচার চক্রের তদন্ত ও শোষণে কার্যক্রম জোরদার করে। জাতিসংঘের অধীন 'ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম (UNODC)' বিশ্বব্যাপী গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করে। তারা নিয়মিত 'গ্লোবাল রিপোর্ট অন ট্রাফিকিং ইন পারসনস' প্রকাশ করে, যা নীতিনির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এর ৮ নম্বর লক্ষ্য 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ' এবং ১৬ নম্বর লক্ষ্য 'পিস, জাস্টিস অ্যান্ড স্ট্রং ইনস্টিটিউশনস' মানব পাচার ও আধুনিক দাসত্ব নির্মূলের অঙ্গীকার করে। বিশেষভাবে SDG 8.7 শিশু শ্রম, জোরপূর্বক শ্রম ও মানব পাচার বন্ধের কথা বলে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সার্ক, আসিয়ানসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক জোট মানব পাচার রোধে যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তথ্য আদান প্রদান, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার ও যৌথ তদন্ত এসব উদ্যোগের মূল অংশ। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার মধ্যে ইন্টারন্যশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন, সেভ দ্য চিল্ড্রেন, অ্যান্টি স্লেভরি ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি সংস্থা ভুক্তভোগী পুনর্বাসন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চেয়ে এসব সংস্থার উপস্থিতিই ভুক্তভোগীদের কাছে বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে।

মানব পাচার প্রতিহত করার জন্য বহু আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো গঠিত হয়েছে। 'ইউনাইটেড নেশনস ট্রাফিকিং প্রটোকল' ২০০০ সালে সংযুক্ত রাষ্ট্রের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ২০০৩ সালে কার্যকর হয়। এতে মূলত তিনটি স্তর বিশ্লেষণ থাকে। পাচার নিরোধ, ভুক্তভোগী সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব উন্নয়ন। এছাড়া, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজ্যুলিউশন ২৩৮৮। এটি মানব পাচার এবং জঙ্গি সংগঠনগুলোর দ্বারা শোষণের বিরোধিতা করে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা জোরদার করে। এই আন্তর্জাতিক আইনগুলোকে প্রতিটি দেশ তাদের জাতীয় আইন দিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

মানব পাচার রোধে বাংলাদেশের দৃশ্যমান উদ্যোগ ব্যপক। বাংলাদেশ মানব পাচারের উৎস, গন্তব্য এবং ট্রানজিট এই তিন ভূমিকাতেই জড়িত। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্যোগ প্রবণতা এবং অভিবাসনের ঝুঁকি বাংলাদেশে এ সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশে মানব পাচার প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো; মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন- ২০১২। এই আইনে মানব পাচারের সংজ্ঞা নির্ধারণ, পাচারকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। নারী ও শিশু পাচারের পাশাপাশি পুরুষ পাচারের বিষয়টিও এতে অন্তর্ভুক্ত। এই আইন মানব পাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধকে কঠোরভাবে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে নির্ধারণ করে, পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধান প্রদান করে। এই আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও যৌথ আইনি সহায়তার সুযোগ রাখা হয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক মানব পাচারের ক্ষেত্রে মিলিত পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন মানব পাচার রোধে পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে।

মানব পাচার প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের। সরকারের অধীনে গঠিত হয়েছে; জাতীয় মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স। এছাড়াও পুলিশের মধ্যে গঠিত হয়েছে বিশেষায়িত ইউনিট, যেমন 'এন্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট (AHTU)'। যারা তদন্ত ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে। সীমান্ত ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেও সরকার মানব পাচার প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত মানব পাচারের একটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB), ইমিগ্রেশন পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো যৌথভাবে এ ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়িয়েছে। বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজ করাও মানব পাচার কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

বাংলাদেশ সরকার 'ন্যাশনাল প্ল্যান অফ একশন' প্রণয়ন করেছে এবং তা ২০২৫ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, শিকারদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও

পুনর্বাসন ব্যবস্থা। সরকার ‘এন্টি ট্রাফিকিং টাস্কফোর্স’ গঠন করেছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ মিডিয়া ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ইউএনওডিসির সহায়তায় বাংলাদেশ ‘গ্লো অ্যাক্ট বাংলাদেশ’ প্রজেক্টের মাধ্যমে UNODC এবং EU সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অংশীদারের সাথে কাজ করছে, যেখানে মানব পাচারের ডাটা সংগ্রহ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন এবং আনুষঙ্গিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উদ্যোগ প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুতি, সীমান্তের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এছাড়া বাংলাদেশ BIMSTEC এর মতো আঞ্চলিক সহযোগিতায় অংশ নিয়ে দূরবর্তী দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে পাচারচক্র বন্ধে কাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ট্রাফিকিং ইন পারসনস (TIP)’ রিপোর্ট ২০২৫ অনুযায়ী, বাংলাদেশ মানব পাচার মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে ও Tier 2 তে রয়েছে, যার মানে সরকার নিম্নতম মানদন্ড পূরণে ব্যর্থ হলেও যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশে মানব পাচার প্রতিরোধে এনজিও সংস্থাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্র্যাক, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, রাইটস যশোর, আশা প্রভৃতি সংস্থা পাচার রোধে সচেতনতা, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। অনেক ভুক্তভোগী এ সকল এনজিও থেকে সহায়তা পেয়েছেন। ব্র্যাক (BRAC), আশা ও উইনরক ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থাগুলো প্রথমত, গ্রামভিত্তিক সভা, গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারণা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে মানব পাচারের কৌশল, প্রতারণা ও সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে। দ্বিতীয়ত, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে এনজিওগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত মানবিক ও কার্যকর। বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (BNWLA) পাচার থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুদের আইনি সহায়তা, নিরাপদ আশ্রয়, চিকিৎসা ও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করে। তৃতীয়ত, নীতিনির্ধারণ ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে এনজিওগুলো সরকারকে মানব পাচারবিরোধী আইন বাস্তবায়নে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এনজিও ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করে একটি কার্যকর প্রতিরোধ কাঠামো গড়ে তুলছে। সব মিলিয়ে, এনজিওগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশের লড়াইকে শক্তিশালী করেছে।

মানব পাচার শুধুমাত্র একটি অপরাধ নয়, এটি একটি বিশাল গ্লোবাল ট্রাজেডি যা মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং মর্যাদাকে বিনষ্ট করে। এ অপরাধের মূল কারণগুলো হলো দারিদ্র্য, বৈষম্য, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। এগুলো সমাধানে সমন্বিত কৌশল প্রয়োজন। এটি মোকাবিলা করতে শুধুমাত্র সরকার নয়, প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, এনজিও, সমাজ ও নাগরিকদের সম্মিলিত উদ্যোগ। সে লক্ষ্যে এই আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধে বৈশ্বিক ও জাতীয় স্তরে আইনগত কাঠামো, কার্যকর নীতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, তথ্য বিনিময় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। বাংলাদেশ এই বিস্তৃত কাঠামোর অংশ হিসেবে আইন প্রণয়ন, জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলোতে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা বাড়িয়েছে, যা মানব পাচার প্রতিরোধে গণ্যযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মানব পাচার প্রতিরোধে একটি বহুমাত্রিক কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। জনসচেতনতা বাড়ানো, সম্ভাব্য ভুক্তভোগীদের শিক্ষা প্রদান, পাচারকারীদের ধরার জন্য শক্ত রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ, দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধানে কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারসহ সকল দেশগুলোকে একসাথে কাজ করতে হবে তথ্য শেয়ারিং ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি জাতিসংঘ, IOM, INTERPOLও NGO এবং স্থানীয় কমিউনিটিগুলোকেও এক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধুমাত্র আইন দিয়ে নয় বরং সচেতনতা, সামাজিক সমর্থন, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই মানব পাচার নির্মূলের কার্যকর পথ।

#

লেখক: প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও কথাসাহিত্যিক।

পিআইডি ফিচার